গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা | ৬ - ১২ জুন ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

চাকরিহারা শিক্ষকদের গ্রেপ্তারের নিন্দায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

চাকরিহারা শিক্ষকদের ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড়ের তীব্র প্রতিবাদ করে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩০ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঘোষিত মিছিল আটকাতে রাজ্য সরকারের পুলিশ যেভাবে শিয়ালদা, ধর্মতলা, বিকাশ ভবনের সামনে থেকে ব্যাপক ধরপাকড় করেছে, বাস, ট্রেন মেট্রো রেল থেকে নামার সময় এবং মিছিল শুরুর আগেই তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে, তাড়া করে তাঁদের ধরেছে, প্রচণ্ড লাঠিচার্জ করে রক্তাক্ত করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গণতন্ত্রের উপর এক চরম আঘাত। ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে মিছিল করার অধিকার সকলেরই আছে। আজ পুলিশের ভূমিকায় এটা স্পষ্ট যে, রাজ্য সরকার শুধু নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে গলা টিপে হত্যা করল তাই নয়, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি যে তাদের নেই— এ কথাও প্রমাণ করে দিল। অথচ মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইন্ডোরে মিটিং ডেকে তাঁদের প্রতি সহানুভূতির কথা শুনিয়েছিলেন। সরকার আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করে তাঁদের চাকরি রক্ষার দাবিকেও অস্বীকার করছে।

আমাদের দাবি, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষকদের অবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে।

বামপন্থী দলগুলির ফ্যাসিবাদবিরোধী আলোচনা সভা

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটের আহ্বানে ২৭ মে এক আলোচনা সভায় একত্রিত হয়েছিলেন এ রাজ্যের বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ ও বামমনস্ক শত শত মানুষ। ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েট জনগণ ও লাল ফৌজের ঐতিহাসিক বিজয়ের ৮০ বছর উপলক্ষে আলোচনার বিষয় ছিল 'সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ ও যুদ্ধ-উন্মাদনার রাজনীতি এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম'। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই-এর পক্ষে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিআই(এমএল) মাস লাইনের নির্ভীক মজুমদার, সিপিআই(এমএল) রেড স্টারের শঙ্কর, সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের অতনু চক্রবর্তী, সিপিআই(এম)-এর অঞ্জন বেরা, এসইউসিআই(সি)-র চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, আরএসপি-র অশোক ঘোষ (ছবিতে বাঁ দিক থেকে)।

বক্তাদের প্রায় সকলের বক্তব্যের মধ্যে যে কথাটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে তা হল, পুঁজিবাদের সংকটের গর্ভেই ফ্যাসিবাদের জন্ম। সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ

আটের পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী বলছেন অনেক জনস্বার্থের পদক্ষেপ কই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি সারা ভারত জুড়ে যে ভাবে যুদ্ধের প্রচার করে চলেছেন, তাতে মনে হচ্ছে 'অপারেশন সিঁদুরে' ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা ইত্যাদি সব যেন তিনিই নিজে হাতে ছুঁড়েছেন! ভারত পাকিস্তানের মধ্যে হয়ে যাওয়া সাম্প্রতিক চার দিনের যুদ্ধ নিয়ে তিনি যা বলে চলেছেন তাতে বলিউডের চিত্রনাট্যকারদের সুবিধা হয়ত হতে পারে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের যে দায়িত্বটা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ওপর বর্তায়, সেই পদক্ষেপ কোথায়?

তিনি কখনও বলছেন, সিঁদুর তাঁর রক্তে বইছে, সেই সিঁদুর নাকি একেবারে বারুদ হয়ে গেছে। কখনও পাকিস্তানের উদ্দেশে বলছেন, হয় রুটি খাও নইলে আমার গুলি খাও ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কোনও মতেই বলছেন না, তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কেন এক মাসেরও বেশি সময় পার করে পহেলগামের খুনি দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার বা তাদের সুনির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করার কাজে পুরোপুরি ব্যর্থ! তাঁর উচ্চগ্রামের বাকপটুতা এবং নাটকীয়তার পরিচয় দেশ অনেক পেয়েছে। তিনি বলেন অনেক, কিন্তু যে কাজগুলি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কাছ থেকে দেশের মানুষ আশা করেন, সেগুলি নিয়ে পুরোপুরি নীরব।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের মানুষের কাছে তাঁর এটুকু দায়বদ্ধতা থাকার তো কথা যে, জনগণের অর্থে চলা সামরিক সরঞ্জাম, অস্ত্র, বিমানের সঠিক ব্যবহার এবং তার ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে দেশের মানুষকে সঠিক তথ্য তিনি বা তাঁর সরকার দেবে! অথচ দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে ভারতের কোনও বিমান ধ্বংস হয়েছে কি না এ বিষয়ে দেশবাসী কোনও প্রশ্ন করলেই তাদের 'পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলা'র দায়ে বিজেপি নেতারা অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু ভারতের 'চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ' সিঙ্গাপুরে বসে যুদ্ধ শেষের ২১ দিন পরে ৩১ মে রয়টার্স এবং ব্লুমবার্গের মতো বিদেশি সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করে নিলেন যুদ্ধের প্রথম পর্বেই ভারতীয় যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে। কতগুলি ধ্বংস হল তা অবশ্য তিনি খোলসা করে বলেননি। যখন সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছে, সংসদীয় বিরোধী দলগুলিও একযোগে প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছে, এই রকম একটা সময়েও দেশের মানুষের কাছে সত্য স্বীকারের সাহসটা প্রধানমন্ত্রী দেখালেন না কেন? তাঁর বীররসে ঘাটতি পড়ার

দুয়ের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের চাপে আদায় হল ছাত্র কাউন্সিল নির্বাচন

কলকাতা মেডিকেল কলেজে জয়ী এআইডিএসও প্রার্থী

রাজ্যের সর্বত্র দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রেখে ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে বাধা দিচ্ছিল রাজ্যের শাসক দল। আর জি কর আন্দোলনের সময় আন্দোলনের চাপে মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হয়েছিলেন মার্চ মাসে নির্বাচন হবে এটা ঘোষণা করতে। কিন্তু শাসক দল তার রীতি অনুযায়ীই প্রতিশ্রুতি রাখেনি। আর জি কর আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়, ছাত্র সমাজ সর্বত্র ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। তারই চাপে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ২ জুন ছাত্র কাউন্সিল নির্বাচন করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

অভয়ার ন্যায়বিচার, ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে থ্রেট কালচার বন্ধ করা, মেডিকেল শিক্ষায় বেসরকারিকরণ বন্ধ করা ও ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে এআইডিএসও প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ছাত্রছাত্রীদের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয় বর্ষের প্রার্থী শিবম মণ্ডল নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে।

এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ছাত্রস্বার্থে ধারাবাহিকভাবে যে আন্দোলন চলছে, মেডিকেল কলেজগুলিতে নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধের যে চর্চার উদ্যোগ এআইডিএসও নিয়েছে নির্বাচনে এই বিজয় তাকে আরও সংহত করবে।

জনস্বার্থের পদক্ষেপ কই

একের পাতার পর

আশঙ্কাতেই কি! দেশের মানুষের থেকে বিদেশি সংবাদমাধ্যমই কি মোদি সরকারের কাছে বেশি নির্ভরযোগ্য? নাকি এই যুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করার বদলে আসলে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, যেটা বিদেশি সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরলে লাভ বেশি! এই প্রসঙ্গে আবার একটু পরে আসছি।

প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুরের পর পাঁচটি রাজ্যে ইতিমধ্যে সভা করেছেন। এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে, এর পরেই ছুটেছেন বিহারে। এক এক জায়গায় এক এক রকম সেজেওছেন, নিশ্চয়ই তিনি এরপর আরও নানা রাজ্যে গিয়ে নানা সাজে আরও কিছু গরম কথা বলবেন। কিন্তু পাকিস্তানের গোলায় কাশ্মীরে যে প্রায় দশ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সব বাড়ির বাসিন্দা পরিবারগুলির সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথাটা মনেই পড়েনি। অথচ এই মানুষগুলিই তো পাকিস্তানি কামানের আঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কাশ্মীরের যে সাধারণ মানুষ পহেলগাম হামলার পর সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হলেন, বনধ করলেন, যে মানুষ নিজেদের রোজগারের কথা না ভেবে বিপদগ্রস্ত পর্যটকদের আশ্রয় দিয়েছেন, বিনা ভাড়ায় টোটোয় কিংবা গাড়িতে চাপিয়ে পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করেছেন কাশ্মীরের এই জনগণের সাথে সর্বপ্রথম দেখা করার প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রী অনুভবই করলেন না! পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের কারণে ক্ষতি তুলে ধরাই প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য হলে এই ভারতীয় নাগরিকদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার কথা তিনি কি না ভেবে পারতেন! কিন্তু তিনি সম্ভবত হিসাব কষে দেখেছেন, এই সীমান্তের হতদরিদ্র পরিবারগুলি এবং কাশ্মীরের বাসিন্দারা অধিকাংশই মুসলিম, ফলে তাঁদের সাথে দেখা করে, তাঁদের কথা প্রচার করে পাকিস্তান বিরোধিতার বকলমে দেশজুড়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উচ্চনাদ তোলার কাজে লাভ বিশেষ কিছু হবে না! তাঁর আসল লক্ষ্য তো ভোট প্রচার, এর বাইরে কোনও নজর তাঁর নেই। সে জন্যই তিনি ও পথে হাঁটেননি।

প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে এসে উচ্চস্বরে ভোটের প্রচার করেছেন, তার জন্য সিঁদুরকে ঘিরে যত ধর্মীয় অনুষঙ্গ টানা যায় তা টেনেছেন। তার সাথে তিনি মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে এবং মালদায় ঘটে যাওয়া দাঙ্গার কথা তুলে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে বিঁধেছেন। বিজেপির সঙ্গে হিন্দুত্বের প্রতিযোগিতায় নেমে তৃণমূল কংগ্রেস এই দাঙ্গা কিছুটা চলতে দিয়েছে সন্দেহ নেই। রাজ্য প্রশাসন না চাইলে এই দাঙ্গা কোনওমতেই হতে পারত না। কিন্তু তাতে কি বিজেপির অপরাধের স্খালন হয়? বিশেষত যখন দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীর সভার পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা উচ্চস্বরে 'হিন্দু ভোট' সংহত করার পক্ষে নেমে পড়েছেন, বোঝা গেল প্রধানমন্ত্রী 'সিঁদুর' নিয়ে আসলে ভোট ব্যবসাতেই নেমেছেন। তবে দেখা যাচ্ছে ১১ বছর কেন্দ্রীয় সরকার চালিয়ে শুধু সিঁদুর আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছাড়া অন্য কিছু বলবার মতো সম্বল তাঁর নেই। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি নিয়ে কিছু কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মন্ত্রকের অধীন সিবিআই কেন বছরের পর বছর ধরে দুর্নীতিগুলির কোনওটিরই কিনারা করতে পারছে না, নাকি করছে না, তার জবাবটা দিচ্ছেন না।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহারে গিয়ে বিক্রমগঞ্জের জনসভায় তিনি বলেছেন, 'প্রতিশ্রুতি পালন করার পর আমি ফিরে এসেছি'। বলেছেন, এটা 'নতুন ভারত', 'রামরাজ্য' এখানে 'প্রাণ যায়ে, পর বচন না যায়ে' (প্রাণ যাক, কিন্তু প্রতিজ্ঞা যাবে না)। প্রধানমন্ত্রীর কথা রাখার বহর দেশের মানুষ জানে। নোট বাতিল করে সন্ত্রাসবাদের কোমর ভেঙে দেওয়া, কালো টাকা উদ্ধার করে ১৫ লক্ষ টাকা সকলের অ্যাকাউন্টে ভরে দেওয়া, বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি, সবকা সাথ সবকা বিকাশ ইত্যাদি যা যা তিনি এতদিন ধরে বলেছেন তার কোনওটি রক্ষা করেছেন কি? দেশের মানুষও কি আশা করে, যে তিনি কথা রাখবেন? 'জুমলা' শব্দটি তো তাঁকে স্মরণ করেই সারা দেশে এখন উচ্চারিত হয়! এই সেই তিনি, যিনি পহেলগাম হামলার দু-দিন পর ২৪ এপ্রিল বিহারের জনসভায় বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদীদের এমন শিক্ষা দেব যা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। সেই কথা রাখার ব্যাপারে কী করেছেন তিনি? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই হত্যাকারীদের তাঁর সরকার আজও খুঁজে বারই করতে পারেনি। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কিছু জায়গায় সেনা অভিযানে ধ্বংস হওয়া কয়েকটি বাড়ির ছবি তাঁরা প্রচার করেছেন। তাতে প্রমাণ হয়ে যায় কি যে সন্ত্রাসবাদীরা নির্মূল হয়ে গেছে? সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সন্ত্রাসবাদীদের জনবিচ্ছিন্ন করা। তার জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন ইসলামিক কিংবা হিন্দুত্ববাদী সব ধরনের মৌলবাদের মোকাবিলা করা। সে জন্য প্রয়োজন দেশে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক পরিবেশের প্রসার।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় জনগণের আস্থা অর্জন, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করা, সমস্ত দিক থেকে উন্নয়ন এবং ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সে রাজ্যের মানুষের সমস্যাকে বোঝা প্রয়োজন। দিল্লির শাসকদের কাছ থেকে এই আচরণ কি কাশ্মীরবাসী পেয়েছেন? নাকি বিজেপি এবং তার প্রভাবিত নানা সংগঠন দেশ জুড়ে কাশ্মীরী তথা সমস্ত মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষকেই দেশের শত্রু সাজিয়ে লড়াইতে নেমেছে! এমনকি যে কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে সামনে রেখে সরকার যুদ্ধের সাফল্য প্রচারে নেমেছিল তাঁকে 'সন্ত্রাসবাদীদের বোন' বলেছেন মধ্যপ্রদেশে বিজেপির এক মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী কি কোনও প্রতিবাদ করেছেন? বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ পহেলগামে নিহতদের স্ত্রীদেরই এই হত্যাকাণ্ড রুখতে না পারার জন্য দায়ী করেছেন। এমন সাংসদের হাত তোলা ভোটেই তো প্রধানমন্ত্রীর দল জনবিরোধী নানা আইন কিংবা মুসলিমদের কোণঠাসা করার জন্য ওয়াকফ আইন পাশ করায়! এমন সব সম্পদদের দলে জায়গা দেওয়ার কারণে তিনি কি একটুও লজ্জিত? তা হলে কোন প্রতিশ্রুতিটি তিনি রাখলেন?

এ বারে আসা যাক অপারেশন সিঁদুরের তথাকথিত সাফল্যগাথা প্রসঙ্গে। সরকারের দুর্বল অবস্থান প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা এবং বাণিজ্য প্রলোভন দিয়ে যুদ্ধ বিরতির দাবি জানানোর পর প্রধানমন্ত্রী একবারও তা অস্বীকার করলেন না। আইএমএফ ভারত সরকারের কথা না মেনে দেউলিয়া পাকিস্তানকে ঋণ মঞ্জুর করে দিয়েছে। 'বিশ্বগুরু' বলে নিজেকে অনেক জাহির করার পর নরেন্দ্র মোদি যুদ্ধের মধ্যে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কার্যত কোনও সমর্থন জোগাড় করতে পারেননি। ফলে এখন দেশে দেশে সাংসদ দল পাঠাতে হয়েছে বিজেপি সরকারকে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বিজেপির সুবিধা করে দিয়েছে সংসদীয় বিরোধী দলগুলি। কারণ ভারতের আসল শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতি তারা সকলেই একই রকম দায়বদ্ধ। তাই এই শ্রেণির নির্দেশে সমস্ত বিরোধী দলকেই দেশের মানুষের কাছে আসল কথা তুলে ধরার বদলে সরকারের রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে বিদেশে দৌড়তে হয়েছে। বিদেশে গিয়ে এখন দেশের নামে আসলে মোদি সরকারের ওকালতি করতে হচ্ছে তাঁদের। এমনকি বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিএমকেও একই কারণে এই দলে ভিড়তে হয়েছে।

ভারতের জনগণ আর শাসক শ্রেণির স্বার্থ যে এক নয়, জনগণ যেমন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, তারা যুদ্ধেরও বিরুদ্ধে, এই কথাটাও আজ এই সব বিরোধীদের বলার উপায় নেই। মনে রাখা দরকার, সন্ত্রাসবাদ এবং যুদ্ধ-উত্তেজনা জিইয়ে রাখার প্রয়োজন ভারত পাকিস্তান উভয় দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির যেমন আছে, তেমনই বিশ্বের নানা দেশের বৃহৎ পুঁজিরও স্বার্থ আছে।

এই প্রেক্ষিতে এ বারে সিঙ্গাপুরে আন্তর্জাতিক 'সাংগ্রি-লা ডিফেন্স' সম্মেলনে গিয়ে ভারতের সেনা প্রধানের ভারতের যুদ্ধকৌশল ব্যাখ্যার কারণটা বুঝতে সুবিধা হবে। তাঁকে সত্যের খাতিরে মানতে হয়েছে যে, ভারতের যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়েছে। আবার সাথে সাথে ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়েছেন, ভারতে তৈরি অস্ত্র কত সরেস, নানা দেশ যেন তা কেনে। সীমিত আঞ্চলিক যুদ্ধের প্রয়োজন আজ এ দেশের এবং বিদেশের বৃহৎ পুঁজি মালিকদের কাছে এ কারণেই বিপুল। এই যুদ্ধে ভারতের এবং নানা দেশের অস্ত্র কোম্পানিগুলির পরীক্ষা হয়েছে।

পহেলগাম সন্ত্রাসের পরেই যেমন অতি দ্রুত মোদি সরকার নতুন করে রাফাল বিমানের বরাত দিতে কয়েক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে ফেলেছে তেমনই আদানি, টাটা, রিলায়েন্স সহ নানা কোম্পানি তাদের অস্ত্র দেখিয়ে কেউ আর্মেনিয়া, কেউ বেলজিয়াম, কেউ ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশে অস্ত্রের অর্ডার জোগাড় করেছে। এ দিকে চিন, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইজরায়েল, তুরস্ক, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের কোম্পানিও কেউ পাকিস্তানকে খুঁটি করে কেউ বা ভারতকে খুঁটি করে বিশ্বের খদ্দেরদের সামনে অস্ত্র প্রদর্শনী করে নিয়েছে। সে জন্যই এই যুদ্ধের প্রয়োজন পুঁজিপতিদের কাছে অসীম। যাঁরা ভাবেন অস্ত্র ব্যবসায় ভারতের কোম্পানির উন্নতি মানে দেশের মানুষের সুরক্ষা— তাঁদের ভাবতে হবে তা হলে অন্য দেশে অস্ত্র বেচতে ভারতীয় মালিকরা এত উদগ্রীব কেন? আজকের দিনে অর্থনীতির সামরিকীকরণই যে পুঁজিবাদের বাঁচার একমাত্র রাস্তা তা বহু আগেই মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের ভিত্তিতে দেখিয়ে গেছেন মহান নেতা স্ট্যালিন। আজ পুঁজিবাদের সংকট এতটাই গভীর, যে ভাবে হোক একটা যুদ্ধ বাধিয়ে অস্ত্র উৎপাদনের ওপরেই জোর দেওয়ার জন্য সামাজিক ছাড়পত্র নিতে না পারলে তাদের সংকট আরও গভীর হবে।

শোষণে জর্জরিত দেশের বেশির ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এতই কম যে, তাদের কেনাকাটার ওপর ভরসা করে পুঁজিপতিদের মুনাফা আজ একেবারে অসম্ভব। ফলে দেশের মানুষের টাকায় অস্ত্র ব্যবসা, সামরিক সরঞ্জাম তৈরি ও বেচা এবং তার প্রয়োজনে যুদ্ধ, এটাই তাদের দরকার। নরেন্দ্র মোদি সহ পুঁজিবাদের সেবাদাসরা এই প্রয়োজন থেকেই আজ সিঁদুর কিংবা কাল হয়ত অন্য কোনও যুদ্ধ উন্মাদনার প্রচারে নামবেনই। উগ্র-পাকিস্তান বিরোধিতা আর একই সাথে মুসলিমদের শত্রু বানানোকেই এরা জাতীয়তাবাদের সাথে সমার্থক করে তুলেছেন। একই কথা প্রযোজ্য পাকিস্তানের শাসকদের জন্য। তাঁরা দেশের মানুষকে জীবনের কোনও আলো দেখাতে পারবেন না জেনেই মৌলবাদ, উগ্র-ভারত বিরোধিতার মধ্যে মানুষকে ফাঁসিয়ে রেখেছেন।

মানুষের জীবনের ক্রমবর্ধমান সংকট থেকে যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে তা যাতে গণআন্দোলনের পথ বেয়ে এই সমাজব্যবস্থার দিকে আঙুল তোলার মতো জায়গায় না যায় তার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার দলগুলির আজ দরকার উগ্র জাতীয়তাবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িক চিন্তায় আচ্ছন্ন জনমন তৈরি করা। জনগণের সামনে তারা ভোট চাইতে গিয়ে কী বলবে? জনগণের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে যে তারা অপারগ! কারণ জনগণের প্রকৃত কল্যাণ করতে গেলে পুঁজিপতিদের লুঠের ভাগে কম পড়ার সম্ভাবনা। তাতে পুঁজিপতিরা রুষ্ট হলে ভোট তহবিলে টাকা দেবে কে? এই কারণেই আজ সব ছেড়ে নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিজেপির সব নেতারা 'সিঁদুর' নিয়েই প্রচারে ব্যস্ত। জনগণের স্বাস্থ্য-শিক্ষা-চাকরির মতো জ্বলন্ত সমস্যাগুলি পিছনে ঠেলে দিতে এটাই তাদের হাতিয়ার।

এই প্রচারের জোরেই তাঁরা সামনের বিহার ভোট কিংবা পরের বছরে পশ্চিমবঙ্গের ভোট পার করতে চাইছেন। এতে তাদের সুবিধা করে দেয় কংগ্রেস কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিরোধীদের জনবিরোধী ভূমিকা। এই দলগুলিও নিজেদের দুর্নীতি, অপশাসন রুখতে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিতে মাতে। এরাও নানা ভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে, নরম হিন্দুত্ব না হলে মুসলিমদের ত্রাতা সাজে। যা সুবিধা করে দেয় বিজেপির রাজনীতিকে। কিন্তু এই ফন্দিও আজ ধরা পড়ে যাচ্ছে অনেকটাই। তাই নরেন্দ্র মোদিকে এখন সস্তা ফিল্মি ডায়লগ দিয়ে বাজার গরম করতে হচ্ছে। এ যেমন তাঁর দুর্বলতার পরিচয়, একই সাথে ভারতীয় সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের দুর্বলতারও লক্ষণ।

জ্ঞানার্জন না করে সাম্যবাদী হওয়া যায় না

মানব সমাজ যে জ্ঞান সম্পদ আহরণ করেছে, তা আয়ত্ত না করেই সাম্যবাদী হওয়া যায়— এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে চলার অর্থ মহা ভুলের খপ্পরে পড়া। যে সম্মিলিত জ্ঞানের ফসল সাম্যবাদ, তাকে আয়ত্ত না করে কেবলমাত্র সাম্যবাদী স্লোগান ও সাম্যবাদী বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ শেখাই যথেষ্ট— এই রকম ভাবলে ভুল হবে। মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডারকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে কী ভাবে সাম্যবাদের উদ্ভব ঘটেছে, মার্ক্সবাদই তা দেখিয়েছে।

আপনারা শুনেছেন এবং পড়েছেন যে, সাম্যবাদী তত্ত্ব, সাম্যবাদের বিজ্ঞান মূলত মার্ক্সেরই সৃষ্টি। তিনি প্রতিভাশালী ঠিকই, কিন্তু মার্ক্সবাদের এই তত্ত্ব আজ আর কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন সমাজতন্ত্রীর নয়, এটা আজ বিশ্বব্যাপী সেই লক্ষ কোটি সর্বহারার তত্ত্বে পরিণত হয়েছে, যারা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তা প্রয়োগ করছে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, কেন মার্ক্সের শিক্ষা সবচেয়ে বেশি বিপ্লবী শ্রেণির লক্ষ কোটি হৃদয় জয় করতে সমর্থ হল, তার একটিই উত্তর— পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করেছে, তারই দৃঢ় ভিত্তির উপর মার্ক্স তাঁর তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছিলেন। মানব সমাজের বিকাশের নিয়ম পর্যবেক্ষণ করে মার্ক্স উপলব্ধি করেন, পুঁজিবাদী সমাজ অবশ্যম্ভাবীরূপে সাম্যবাদে পরিণতি লাভ করবে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, মার্ক্স পুঁজিবাদী সমাজের নির্ভুল, পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ও বিজ্ঞানের এ-তাবৎকালের সমস্ত সৃষ্টিকে একত্রিত করেই এই কথাটি প্রমাণকরেছিলেন। কোনও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়কেও অবজ্ঞা না করে মানব সমাজের সকল সৃষ্টিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি পুনর্গঠিত করেছিলেন। মানুষের চিন্তাপ্রসূত সব সৃষ্টিকে তিনি পুনর্বিবেচনা করেছেন, বিচারের বিষয় করে তুলেছেন এবং শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ এবং সংস্কারে আচ্ছন্ন কেউ তা পারেননি।

ভি আই লেনিন

যেমন ধরুন, সর্বহারা সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে— আমরা এই বিষয়টি ধরতে পারব না, যদি না, সর্বহারা সংস্কৃতি নিশ্চিতরূপে তারই বিকাশের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। এই সকল পথই আমাদের সর্বহারা সংস্কৃতির দিকে নিয়ে চলেছে এবং নিয়ে যেতে থাকবে। যেমন রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র মার্ক্সের হাতে নতুন রূপ গ্রহণ করে দেখিয়েছে মানবসমাজকে কোথায় পৌঁছাতে হবে। দেখিয়েছে, শ্রেণি সংগ্রামের পথ ধরে সর্বহারা বিপ্লবের সূচনাকে।

পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে কেবলমাত্র সঠিক জ্ঞান আর মানবজাতির সামগ্রিক বিকাশের ধারায় প্রাপ্ত সংস্কৃতির রূপান্তর সাধনের মধ্য দিয়েই সর্বহারা সংস্কৃতি সৃষ্টি করা যাবে। সর্বহারা সংস্কৃতি আকাশ থেকে পড়েনি। যারা নিজেদের সর্বহারা সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ ভাবে, এটা তাদেরও আবিষ্কার নয়। এ সবই মূর্খতা। পুঁজিবাদী, সামন্তী ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের গোলামির ভিতরে থেকেও মানবজাতি যে জ্ঞান সঞ্চিত করেছে,

আমাদের মুখস্থ করার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা প্রতিটি ছাত্রের মনকে খাঁটি সত্য ধারণার সাহায্যে উন্নত ও ত্রুটিহীন করতে চাই। প্রাপ্ত শিক্ষাকে মনের মধ্যে পরিপাক করতে না পারলে সাম্যবাদ একটি ফাঁকা বুলিতে পরিণত হবে, একটি সাইনবোর্ড মাত্র হয়ে দাঁড়াবে এবং একজন কমিউনিস্ট এক দাম্ভিক ব্যক্তিতে পরিণত হবে। এই জ্ঞানকে শুধুমাত্র আয়ত্ত করলেই হবে না, একে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। যাতে একদিকে আপনার মন অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুতে ভারাক্রান্ত না হয়, অন্য দিকে আজকের দিনে সুশিক্ষিত মানুষের পক্ষে যে সব সত্য জানা অপরিহার্য, তার দ্বারা আপনাদের মন যেন সমৃদ্ধ হয়। কোনও সাম্যবাদী যদি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে এবং কঠোর শ্রমের সাহায্যে সত্যকে যাচাই না করে, না বুঝেই সাম্যবাদ সম্পর্কে কেবলমাত্র কিছু বিচ্ছিন্ন শুকনো বুলি শিখেই সাম্যবাদের জ্ঞান জাহির করতে থাকে, তা হলে সব দিক থেকেই সে একজন অধঃপতিত কমিউনিস্ট। এ ধরনের ওপর ওপর জানা খুবই মারাত্মক। যদি জানি যে আমার জ্ঞান অল্প, তা হলে আরও বেশি জানার চেষ্টা করব। কিন্তু যদি কেউ বলে যে, সে একজন কমিউনিস্ট অতএব তার আর কিছুই গভীর ভাবে জানার দরকার নেই, তা হলে সে আর যাই হোক, কমিউনিস্ট হতে পারবে না।

'দি টাস্ক অফ দি ইউথ লিগ' থেকে

ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি!

সাধারণ মানুষের কী এল গেল

এ রকম একটা বিরাট 'সুখবর' যা দেওয়ার কথা ছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর, অথচ দিলেন নীতি আয়োগের সিইও বি ভি আর সুব্রহ্মণ্যম। নীতি আয়োগের দশম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকের পর উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি জানালেন, জাপানকে পিছনে ফেলে ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। চলতি বছরের এপ্রিলে প্রকাশিত আইএমএফ-এর ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক অনুযায়ী আমেরিকা, চিন, জার্মানি রয়েছে ভারতের আগে। আর ভারতের ঠিক পরেই রয়েছে 'উদীয়মান সূর্যের দেশ' জাপান। লক্ষণীয় বিষয়, এই ঘোষণা আইএমএফ যে দিন করছে সে দিনই তারা জানিয়েছে ২০২৫ এবং '২৬ সালে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি কমবে। বাস্তবে গত ১০ বছরে ভারতের জিডিপি বাড়েনি, বরং কমেছে। ২০১৬ সালে যা ছিল ৮.৩ শতাংশ, তা এখন ৬.২ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী এই সুখবর না দিলেও মোদি-অনুগামীরা এমন প্রচারে নেমে পড়েছে যেন মনে হচ্ছে ভারতের সব মানুষ বড়লোক হয়ে গেছে। জীবনের সকল দুঃখ-দুর্দশা সব নিমেষে এ বার গায়েব হয়ে যাবে। আসুন আমরা বরং বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি ভারতের বাস্তব ছবিটা মিলিয়ে দেখে নিই।

কেউ বলতেই পারেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চতুর্থ অর্থনীতির দেশ— এটা কি কম বড় ব্যাপার! এই উন্নয়ন কি মিথ্যা? না, অবশ্যই মিথ্যা নয়। কিন্তু এই সত্য, মিথ্যার থেকেও ভয়ঙ্কর। কারণ, জিডিপি, মাথাপিছু আয়— অর্থনীতির এইসব হিসাব দিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রকৃত অবস্থাটা বাস্তবিকই বোঝা যায় না। ভারতে মাথাপিছু আয় বছরে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, মানে মাসে ১৯,৫৮৩ টাকা। আপনার ঘরের বেকার যুবক, রাস্তার ওই ভিক্ষুক — এই হিসাবে তারও মাসিক আয় নাকি এতখানিই! হাস্যকর নয় কি? এই হিসাব হচ্ছে আসলে মেলার আয়না ঘরের মতো। নানা আকৃতির আয়না, যা আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে দেয় না। আয়না যেমন দেখায় আপনি নিজেকে তেমনই দেখেন।

তর্কের খাতিরে মাথাপিছু আয়কে যদি উন্নয়নের মাপকাঠি ধরাও যায়, তা হলেও কিন্তু ধাক্কা খেতে হয়। তথ্য বলছে, জিডিপি-র বিচারে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হলেও মাথাপিছু আয়ের নিরিখে তার স্থান ১৯৭টি দেশের মধ্যে ১৩৬তম। আফ্রিকার কেনিয়া-মরক্কো-লিবিয়ার মতো দেশেরও পিছনে। সরকার নিজেই বলছে ভারতের ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্য না দিলে তারা নাকি বাঁচবে না! ওয়ার্ল্ড ইন ইকুয়ালিটি ল্যাবে টমাস পিকেটি, লুকাস চ্যান্সেলর ও নীতিন কুমার ভারতী কর্তৃক রচিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দেশের শীর্ষ ১ শতাংশ মানুষের আয় ও সম্পদ ছিল যথাক্রমে দেশের মোট আয়ের ২২.৬ শতাংশ ও মোট সম্পদের ৪০.৫ শতাংশ। কিন্তু এই ১ শতাংশ মানে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ধনীতম মানুষ যে বিপুল সম্পদ ও আয়ের অধিকারী, যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, তা যদি হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয় তা হলে এক ধাক্কায় ভারতের জিডিপি কমে আফ্রিকার যে কোনও অতি দরিদ্র দেশের সমান হয়ে যাবে।

দেশে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তা তৈরি করেছে দেশের শ্রমজীবী মেহনতিরা। অথচ তা কেড়ে নিয়েছে এই এক শতাংশ। বাকি নিরানব্বই শতাংশ বঞ্চিত, নিপীড়িত। এই চিত্র বিশ্বজোড়া। যত দিন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা ছিল ততদিন বিশ্বের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতো ভারতের শাসকরাও এই শোষণ-বঞ্চনার ওপর কিছুটা লাগাম দিতে বাধ্য হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সাময়িক বিপর্যয়ের পর যখন নয়া উদারবাদী অর্থনীতি এল, বিশ্ব একমেরু হয়ে উঠল, তখন থেকেই এই শোষণ ও বঞ্চনা হয়ে উঠল লাগামহীন। ২০০০ সাল থেকে ভারতে আর্থিক বৈষম্য আকাশছোঁয়া হয়ে উঠল এবং সেই বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। তথ্য অনুসারে ভারতে ধনকুবেরের সংখ্যা ১৯৯১ সালে ১ জন থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে ১৬৬ জন (ফ্রন্টলাইন ২৩/০৩/২৪)। অন্য দিকে আর্থিক বৈষম্য ব্রিটিশ আমলকেও ছাপিয়ে গেছে।

জনসংখ্যা	গড় আয় (মাসে)
সমগ্র দেশবাসী	১৯,৫৮৩ টাকা
শীর্ষ ০.১ শতাংশ	১৮,৭৫,০০০ টাকা
১ শতাংশ	৪,৪১,৬৬৭ টাকা
মধ্যম ৪০ শতাংশ	১৩,৭৫০ টাকা
সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ	৫৯৩০ টাকা

(দ্য ওয়্যার ২৬/০৫/২৫)

অক্সফাম ইন্ডিয়া ২০২৩ সালের প্রতিবেদন, 'সারভাইভাল অফ দ্য রিচেস্ট ঃ দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি'-তে বলেছে— দেশের এক শতাংশ মানুষ মোট সম্পদের ৪০.৫ শতাংশের মালিক, ১০ শতাংশ মানুষ ৭৭ শতাংশ সম্পদের মালিক, আর নিচের ৫০ শতাংশ মানুষ দেশের মোট সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশের মালিক (দ্য ওয়্যার ২৬/০৫/২৫)।

নয়া উদারবাদী ভারতে পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে চলছে ধনকুবেরদের লুণ্ঠন-রাজ। বৃহৎ একচেটিয়া কোম্পানিগুলির কাছ থেকে কর্পোরেট ট্যাক্স নয়, মানুষের পকেট কেটে পরোক্ষ করের মাধ্যমে সরকার তার আয় বাড়াচ্ছে। মুষ্টিমেয়র স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে দারিদ্রের অতল গহ্বরে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, কম মজুরি, কাজের অভাব, প্রবল বেকারত্ব, বিশাল

সাতের পাতায় দেখুন

বন্যা-ভাঙন-খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে
মেচেদায় সারা বাংলা কনভেনশন

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম সহ কয়েকটি জেলা খরা-কবলিত। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি কয়েকটি জেলা বন্যা-কবলিত। আবার মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর সহ কয়েকটি জেলার বিরাট অংশ ভাঙনের কবলে পড়ে ফি বছর সর্বস্বান্ত হন হাজার হাজার মানুষ। এই সমস্যাগুলি সমাধানের লক্ষ্যে ৩১ মে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচেদার বিদ্যাসাগর হলে দুই শতাধিক ভুক্তভোগী মানুষের উপস্থিতিতে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সূর্য প্রধান। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন উৎপল প্রধান। মূল প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। বিশিষ্টদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পঞ্চানন প্রধান, গোপাল বিশ্বাস, নারায়ণচন্দ্র নায়ক। সভা সঞ্চালনা করেন দিলীপ কুণ্ডু।

কনভেনশনে রাজ্য সরকারের 'নো কস্ট' পদ্ধতিতে নদী ও খাল সংস্কারের নানা দিক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সভা থেকে রাজ্যগতভাবে আন্দোলনের লক্ষ্যে 'সারা বাংলা বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটি' গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। বর্ষার পূর্বে সেচমন্ত্রীকে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দেওয়ারও কর্মসূচি গৃহীত হয়।

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে
পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে মিছিল

এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে ২৭ মে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে সমস্ত ওষুধ সরবরাহ, হাসপাতালে এমআরআই মেশিন ও অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন, দালাল চক্র বন্ধ, আইসিইউ সহ বেড সংখ্যা বৃদ্ধি, আউটডোর চত্বরে পানীয় জল, বাথরুম সহ ১৭ দফা দাবিতে হাসপাতালে সুপারিনটেনডেন্টের দফতরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সামিরুদ্দিন সহ পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল হাসপাতাল সুপারের সাথে আলোচনা করেন। হাসপাতাল সুপার দাবিগুলোর সঙ্গে একমত হয়ে দ্রুত কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ডেপুটেশনের আগে একটি সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

এআইডিওয়াইও-র মালদা জেলা সম্মেলন

যুব আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে ৩১ মে মালদা জেলা প্রথম যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণপল্লীতে। উপস্থিত ছিলেন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক মাইতি, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুশান্ত ঢালী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে চলছে চূড়ান্ত দুর্নীতি। সীমাহীন দুর্নীতির ফলে রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বিপন্ন। রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এআইডিওয়াইও আন্দোলন করছে। তাঁরা বলেন, দেশে যুবকদের নৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। মাদকদ্রব্য, অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে। নানা উপায়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে বিভাজন করার চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে এআইডিওয়াইও-র নেতৃত্বে দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে।

কমরেড উজ্জ্বলেন্দু সরকারকে জেলা সভাপতি এবং কমরেড সুভাষ সরকারকে সম্পাদক করে ২১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

মোটরভ্যান চালকদের
রাজ্য পরিবহণ দপ্তর অভিযান

মোটরভ্যান তুলে দেওয়ার চক্রান্ত রুখতে এবং চালকদের উপর প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ, লাইসেন্স, পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি সহ ছয় দফা দাবিতে ২৮ মে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের উদ্যোগে হাজার হাজার চালকের পরিবহণ দপ্তরে বিক্ষোভ অভিযান হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ৫ হাজারেরও বেশি মোটরভ্যান চালকের সুসজ্জিত, স্লোগানে মুখরিত দৃপ্ত মিছিল এস এন ব্যানার্জী রোড হয়ে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে পৌঁছায়। সেখানে ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা, সহ সম্পাদক কমরেড অংশুধর মণ্ডল ছাড়াও বিভিন্ন জেলার মোটরভ্যান চালক ও সংগঠকরা বক্তব্য রাখেন।

আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রাম ও কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর ইউনিয়নের রাজ্য সহ সভাপতি জ্যোতি রঞ্জন সরকার। রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহার নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল ৬ দফা দাবিপত্র নিয়ে পরিবহণ মন্ত্রীর দপ্তরে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। রাজ্য সম্পাদক বলেন, মোটরভ্যান চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে এবং অবিলম্বে ৬ দফা দাবি পূরণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। জেলায় জেলায় প্রথমে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। তার পর রাজ্যে মোটরভ্যান চালকদের পরিবার সহ বিশাল জমায়েত করে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করার মতো আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

কমরেড অশোক দাস মোটরভ্যান চলাচল বজায় থাকার প্রশ্নে ২০০৬ সাল থেকে ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত ধারাবাহিক আন্দোলনের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

এআইইউটিইউসি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ও স্বতন্ত্র জাতীয় ফেডারেশন সমূহের ডাকে ৯ জুলাই সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল করতেও তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশে আবেদন করেন।

শিক্ষকদের উপর বর্বর হামলা
তীব্র নিন্দা এআইডিএসও-র

চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাজ্যের তৃণমূল সরকারের পুলিশ যেভাবে হেনস্থা ও গ্রেপ্তার করেছে, ৩০ মে এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়।

তিনি বলেন, রাজ্যের ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি হারিয়ে বর্তমানে চরম অনিশ্চয়তায় দিনযাপন করছেন। এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় রাজ্য সরকারের। কিন্তু রাজ্য সরকার চাকরি বাতিলের দায় বিচারব্যবস্থার উপরে চাপিয়ে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবার পরীক্ষায় বসতে বাধ্য করছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অনৈতিক।

তিনি বলেন, দেশে মিছিল, জমায়েত, অবস্থান করার গণতান্ত্রিক অধিকার যা দেশের সংবিধান দিয়েছে তাও আজ রাজ্যের তৃণমূল সরকার মানতে চাইছে না। আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই দল ও সরকারের এখন একমাত্র ভরসা পুলিশ, হুমকি, গ্রেপ্তারি, মিথ্যা মামলা। বিবৃতিতে দাবি জানানো হয়, অবিলম্বে গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষকদের মুক্তি দিতে হবে, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফিরিয়ে দিতে হবে, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত পুলিশকে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের গ্রেপ্তার করতে ও শাস্তি দিতে হবে।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে দাবি পেশ পানচাষিদের

৩১ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক অফিসে রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তর আহুত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সারা বাংলা পানচাষি সমিতির পক্ষে নারায়ণ দাস দাবি জানান, আড়তদার ও ব্যবসায়ীদের নানা বেআইনি কাজ এবং পান চাষিদের থেকে কমিশন নেওয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বৈঠকে মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলাশাসক, রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সহ অন্যান্যরা ছিলেন। কাকদ্বীপ মহকুমার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সামনেই পান চাষি সমিতি পাথরপ্রতিমা এবং কুলপি ব্লকের পান চাষি সংগঠনের প্রতিনিধিরা জোরালো দাবি তুললে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

শহিদ কমরেড আব্দুল ওদুদ স্মরণে সভা

১৯৯৮ সালের ২৯ মে সিপিএম আশ্রিত ঘাতকবাহিনী নৃশংস পাশবিকতায় প্রকাশ্য দিবালোকে নদিয়ার বারুইপাড়া বাজারে সেক্টর অফিসে আলোচনার নামে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে এস ইউ সি আই (সি) দলের অবিভক্ত নদিয়া জেলা কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট জননেতা ও শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড আব্দুল ওদুদকে।

অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ২৯ মে বারুইপাড়া বাজারে বীর শহিদ কমরেড আব্দুল ওদুদের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সেখ খোদাবক্স। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান ও বীর শহিদ কমরেড আব্দুল ওদুদ স্মৃতিভবনের সম্পাদিকা কমরেড ইসমত আরা খাতুন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও গভীর আবেগে ও শ্রদ্ধায় দলের নেতা-কর্মী সহ বিপুর সংখ্যক সাধারণ মানুষ স্মরণসভায় যোগ দেন। বারুইপাড়া কদমতলা বাজার থেকে শুরু হয়ে একটি সুসজ্জিত মিছিল পুরো গ্রাম পরিক্রমা করে।

ব্যাঙ্ককর্মীকে কাজে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের বাঁকুড়া জেলার জীবনপুর শাখার জনৈক আর্মড গার্ডকে গত বছরের ৩ অক্টোবর থেকে ব্রাঞ্চ অফিসে কাজ করতে দিচ্ছেন না সেখানকার ব্রাঞ্চম্যানেজার। এ ব্যাপারে ৭ মাস ধরে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে নানা আলাপ-আলোচনা করেও ফল না হওয়ায় ৮ মে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিক্ষোভে প্রায় ৩০ জন ব্যাঙ্ককর্মী ছাড়াও এলাকার বহু মানুষ অংশ নেন।

শতাধিক মানুষের বিক্ষোভ সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী সহ উচ্চপদস্থ অফিসারেরা ঘটনাস্থলে যান। কর্মীদের অনড় বিক্ষোভের ফলে ম্যানেজার ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত তিনি পুলিশ অফিসারদের সামনে বলতে বাধ্য হন যে, ভেন্ডার মেইল পাঠালে তিনি উক্ত আর্মড গার্ডকে কাজে যোগ দিতে বাধা দেবেন না। এই আন্দোলনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল এবং রাজ্য সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস।

ভেন্ডারকে এ কথা জানানো সত্ত্বেও ভেন্ডার কোনও মেইল না পাঠানোয় আবারও ২১ মে এই দাবি সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে যুক্ত করে কলকাতার পার্ক সার্কাসে অবস্থিত ভেন্ডার পিভিএস প্রাইভেট লিমিটেডের হেড অফিসে শতাধিক ব্যাঙ্ককর্মী ওই ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান। ভেন্ডার অফিসের কর্মীরা এ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের জোনাল হেডের নেতৃত্বে ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার জন্য জোনাল অফিসে যান। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের আলোচনায় কিছু শর্ত সাপেক্ষে উক্ত কর্মীকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিড়ি শ্রমিকদের পাশে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি

২৮ এপ্রিল রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি ও নারী দিবস উদযাপন মঞ্চের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর রোকেয়া ভবনে মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের মালিকদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার কথা শুনতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক স্বাতী ভট্টাচার্য। মুর্শিদাবাদের ৮টি ব্লক থেকে শ্রমিকরা তাঁদের বঞ্চনার কথা জানাতে আসেন।

শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, মালিকরা বিড়ির কার্ড বন্ধকরে দিচ্ছে, পিএফ দেওয়া হচ্ছে না, লগবুক দিচ্ছে না, সরকার নির্ধারিত ঘোষিত মজুরি হাজার বিড়ি পিছু ২৭২ টাকা হওয়া সত্ত্বেও কোনও মালিকই তা দিচ্ছে না। পাতার ওজন কম হলে শ্রমিকদের কিনে পুষিয়ে দিতে হয়। দশ বারো ঘণ্টা বসে বিড়ি বেঁধে শ্বাসকষ্ট, কোমরের ব্যথা বেড়ে যায়। রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক খাদিজা বানু ও নারী দিবস উদযাপন মঞ্চের স্বাতী ভট্টাচার্য শ্রমিকদের বঞ্চনার কথা শুনে আগামীতে দাবি আদায়ের বৃহত্তর আন্দোলনের আহ্বান জানান।

এআইডিওয়াইও-র কাছাড় জেলা সম্মেলন

২৭ মে আসামে এআইডিওয়াইও-র কাছাড় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত হারে বেকার ভাতা প্রদান, শূন্যপদে নিয়োগ, মদ-ড্রাগ, অশ্লীলতা সহ ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বন্ধ করার দাবিকে সামনে রেখে একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর, সর্বভারতীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ অঞ্জন মুখার্জী, জেলা সম্পাদক বিজিৎ কুমার সিনহা, সভাপতি অঞ্জন কুমার চন্দ, সহ-সভাপতি পরিতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সম্মেলনের দাবিগুলি নিয়ে অঞ্জন কুমার চন্দের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্যামদেও কুর্মী।

মুখ্য বক্তা নিরঞ্জন নস্কর যুবকদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠে বেকার সমস্যার সমাধান সহ উন্নত নীতি নৈতিকতার ভিত্তিতে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। দিলীপ কুমার রী-কে সভাপতি, পরিতোষ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

পহেলগাম ঃ নিরাপত্তার দায় পর্যটকদের ঘাড়েই চাপালেন দায়িত্বজ্ঞানহীন বিজেপি নেতারা

২২ এপ্রিল পহেলগামে সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুতে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ রাজকুমার জাংড়া সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, সেখানে আক্রান্ত পর্যটকদের সঙ্গে থাকা মহিলারা যদি বীরাঙ্গনা হতেন, জঙ্গিদের সাথে লড়াই করতে পারতেন, তা হলে ওই পর্যটকদের জঙ্গিরা হত্যা করতে পারত না। তাঁরা যদি জীবনের পরোয়া না করে রুখে দাঁড়াতেন, তা হলে এত জন মারা যেত না। সাংসদের মন্তব্য শুনে বিস্মিত দেশের মানুষ। একজন সাংসদ এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করলেন কী করে— এ কথা ভেবে তাঁরা স্তম্ভিত।

প্রশ্ন ওঠে, সশস্ত্র জঙ্গিদের সঙ্গে ভারতের সশস্ত্র সেনারা লড়াই করে পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে পারল না কেন? জানা গেছে, জঙ্গি হামলার আগাম সতর্কবার্তা ছিল গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে। সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর সফরের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তা হলে এ রকম একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর অঞ্চলে জঙ্গি হামলা হতে পারে জেনেও পর্যটকদের যেতে দেওয়া হল কেন? সরকার তো নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় দায়বদ্ধ। তা হলে এতগুলি মানুষের মৃত্যুর জন্য সরকারকে দায়ী না করে জঙ্গি হামলায় মৃতদের পরিজনদের উপর দায় চাপানো হচ্ছে কেন?

প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকলেই গত কয়েক বছর ধরে ‘কাশ্মীর সন্ত্রাস-মুক্ত’, ‘কাশ্মীর হাসছে’ বলে প্রচার করে চলেছেন, তা কি তা হলে জুমলা ছিল? সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের এই আশ্বাসে ভরসা করেই তো পর্যটকরা সেখানে গিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে জঙ্গিদের নৃশংস হামলার শিকার হলেন তাঁরা। এর দায় কার? সরকারের উপর আস্থা রেখে কি তাঁরা ভুল করেছিলেন? তা হলে সাধারণ মানুষ কার উপর আস্থা রাখবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কর্তাদের জানা আছে। উত্তর জানেন মধ্যপ্রদেশের ওই বিজেপি সাংসদও। দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে এ সরকার যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ— পহেলগামের ঘটনায় তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় উনি আসলে সেই অপদার্থতাকেই ঢাকতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য।

এই মন্তব্যের দ্বারা নিজের মানবিকতা বোধহীন চরিত্রটিকে আরও স্পষ্ট করলেন ওই বিজেপি নেতা। চোখের সামনে প্রিয়জনকে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখলে তার পরিজনদের কী যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি হয়, তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও কী করে পরিজনদের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য তিনি উপস্থিত মহিলাদের দায়ী করতে পারলেন, ভাবলেও অবাক হতে হয়। একজন মানুষ কতটা অমানবিক, কতটা নিষ্ঠুর হলে এমন কথা বলতে পারেন! পহেলগামের ঘটনার পর এ ধরনের একের পর এক লাগামছাড়া মন্তব্যের পরও প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা উৎসাহিতই করেছে বিজেপি নেতা-কর্মীদের।

যে কোনও ধর্ম-বর্ণের সাধারণ মানুষ শান্তি চায়। রুজি-রোজগারহীন, আতঙ্কের পরিবেশ তাদের কাম্য নয়। অস্থির পরিবেশে লাভ হয় শাসক শ্রেণির। পহেলগামের ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের মৃত্যুতে আজ প্রশ্ন উঠছে, সন্ত্রাসবাদীদের তো শাস্তি দিতেই হবে, কিন্তু এই সব বিবেচনাহীন কু-মন্তব্যকারী শাসক দলের নেতাদের শাস্তি কে দেবে?

পাঠকের মতামত

ত্রাণ নয়, সুউচ্চ বাঁধ চাই

বর্ষা এসে গেছে। বাড়ছে নদীর জলস্তর। ইতিমধ্যে এই কোটালে পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুরের বাঁধ নিশ্চিহ্ন। সুন্দরবনের বহু ব্লকের শত শত বিঘা শাক-সবজি, পানবরজ, পুকুর, খাল-বিল নোনা জলের তলায়। শুরুতেই এই অবস্থা— এখনও বর্ষার পুরো মরশুম শুরু হয়নি।

মথুরাপুর-২ ব্লকের দক্ষিণ কঙ্কনদিঘির বাসিন্দা জয়দেব মাজী কথা প্রসঙ্গে বললেন, নদী ক্রমশ জনবসতিকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। তিনি নিজে ১৩ বার রিং-বাঁধের পরিবর্তন দেখেছেন। তাঁদের নিজেদের ধান চাষের ৮ বিঘা জমি মণি নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে। কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি।

তিনি আরও জানালেন, মুণ্ডাপাড়া ও ডাক্তারের ঘেরীর পশ্চিমে মণি নদী পূর্ব দিকে ছাতুয়া নদী বুড়ির পোল থেকে মোল্লার মুখ হয়ে মণি নদীতে পড়েছে। এই মুণ্ডাপাড়া ও ডাক্তারের ঘেরীর সংযোগস্থলে ২০-২৫ ফুটের মধ্যে দুপারে দুটি নদী বয়ে চলেছে। যে কোনও মুহূর্তে দুটি নদী মিশে যেতে পারে। এর ফলে নগেন্দ্রপুর, কঙ্কনদিঘী দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাধারণ মানুষ ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

পূর্ব জটার তারক মণ্ডলের ঘেরীর বাসিন্দারা জানালেন, ঠাকুরান নদীর গর্ভে তাদের কয়েক হাজার বিঘা জমি চলে গিয়েছে। তাদের দেখা বাঁধ ৮-৯ বার পরিবর্তিত হয়েছে। নদীবেষ্টিত সুন্দরবনের প্রতিটি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে এই রকমই পরিস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

স্থানীয় মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়করা বাঁধ রক্ষার জন্য যদি সত্যিই কার্যকরী পদক্ষেপ নিতেন তা হলে প্রতি বছর সুন্দরবনবাসীদের সহায় সম্পদ হারিয়ে দিনের পর দিন জলবন্দি অবস্থায় থাকতে হত না। শুখা মরসুমে শীতঘুমে থেকে ভরা বর্ষায় ভাঙা বাঁধে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ভোটের অঙ্ক ঠিক রাখতে, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এরা যথেষ্ট পটু। অথচ এখানে আছে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ। এখান থেকে বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, কৃষিজ সম্পদের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রতি বছর শত শত কোটি বৈদেশিক মুদ্রা ও হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স আয় করেন। এখান থেকে উভয় সরকার যা ট্যাক্স বাবদ আদায় করে সেটাই ফিরিয়ে দিলে উন্নত দেশগুলোর মতো বাঁধ রক্ষা করে এখানকার জীবন জীবিকা যথেষ্ট স্বাবলম্বী ভাবে রক্ষা করা যায়।

নিম্নচাপের কোনও সম্ভাবনা দেখা দিলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য জেলা প্রশাসন প্রস্তুত। কিন্তু সুন্দরবনবাসীরা আজ আওয়াজ তুলেছে— ত্রাণ নয়, চাই সুউচ্চ স্থায়ী মজবুত নদীবাঁধ, শ্রমনির্ভর শিল্প, মাছ-কাঁকড়া-শাকসবজি সংরক্ষণের পরিকাঠামো এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

বিশ্বনাথ সরদার
রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পরিস্থিতি উদ্বেগজনক

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় গোটা দেশ শিহরিত, ব্যথিত ও মর্মাহত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল নির্বিশেষে সকলেই ঘৃণায় ফেটে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে উচিত ছিল নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। বাস্তবে দেশবাসীকে এই নারকীয় ঘটনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা দূরের কথা, কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন উগ্র হিন্দুত্ববাদী শাসক বিজেপি ও তার নানা শাখা সংগঠন গোটা দেশকে চরম বিভাজনের রাস্তায় নিয়ে গেল। সুপরিকল্পিত ভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যাপক ভাবে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হল। কোথাও শারীরিক ভাবে, কোথাও মানসিক ভাবে নানা জায়গায় চলল নির্যাতন। এমনিতেই মোদি সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনা বেড়েই চলেছিল, কিন্তু পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর ভারতে মুসলিম বিরোধী ঘৃণামূলক ঘটনা উদ্বেগজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস (এপিসিআর) তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে ২২ এপ্রিল থেকে ৮ মে মাত্র ১৭ দিনে ১৮৪টি ঘৃণামূলক হামলার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। বাস্তবে যা এর থেকে আরও অনেক গুণ বেশি। আমরা দেখেছি গোটা দেশ জুড়ে কী ভাবে বিজেপি নেতারা মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েছে, টিভিতে, সংবাদপত্রে, সোশাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে সর্বত্র ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, যার পরিণতিতে কোথাও মুসলমান সম্প্রদায়ের কারও দোকানে ভাঙচুর, আগুন লাগানো, কোথাও হকারদের শারীরিক নিগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গে এক গর্ভবতী মুসলিম মহিলাকে চিকিৎসা পরিষেবা না দিয়ে তার সঙ্গে ঘৃণা ও বৈষম্যমূলক আচরণ, কোথাও ঘোষণা করে দেওয়া যে, কোনও মুসলিম মানুষকে দোকানে উঠতে দেওয়া হবে না, কিংবা কোনও মুসলিমের দোকান থেকে কোনও জিনিস কেনা যাবে না। আরও দুঃখজনক ঘটনা আগ্রার তাজপুরে ২৩ এপ্রিল ওই ঘটনার পরের দিন মহম্মদ গুলফাম নামে এক মুসলিম যুবককে তাদের বিরিয়ানির দোকানের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং তাঁর ভাইপো গুলিবিদ্ধ হন। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে গোরক্ষা বাহিনী হুমকি দিয়ে বলছে ২৬ জন মানুষের হত্যার বদলা আমরা ২৬০০ মুসলিম হত্যা করে নেব। কলকাতা মেডিকেল কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ডাক্তারি ছাত্রকে হেনস্থা হতে হচ্ছে, আবার কোথাও পথেঘাটে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের দিকে কুরুচিকর মন্তব্য ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। যে ভাবে চারিদিকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবা ফুলে, শরৎচন্দ্র, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, আসফাকুল্লার দেশে যা খুবই বেদনার। সাম্প্রদায়িক বিভাজন সন্ত্রাসবাদকেই মদত দেয়, বিচ্ছিন্নবাদীদেরই প্রশ্রয় দেয়। সত্যিই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেলড়তে গেলে চাই গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যা সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও সন্ত্রাসবাদের মতো ক্যান্সারকে নির্মূল করতে পারবে।

অর্ঘ্য প্রধান
কাঁথি

এ কথা কাকে বলব !

এ সমস্ত কথা কাকে বলব? জানা নেই।

কোনও নেতা-মন্ত্রীকে বলে কিছু হবে না তা জানি। অগত্যা কলম ধরলাম। খবর পেলাম আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম তিন মুখ ডাঃ অনিকেত মাহাতো, ডাঃ আসফাকুল্লা নাইয়া ও দেবাশিষ হালদার তিনজনকেই কাউন্সিলিংয়ের নিয়ম ভেঙে বেআইনিভাবে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে অনেক দূরে। কারণটা সকলেই বুঝেছেন। খবরটা শুনে রাস্তাঘাটে, অফিসে, ট্রামে-বাসে সর্বত্রই মানুষজন বলছে— ‘গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিল একেবারে’।

কিন্তু বিষয়টা কি শুধুই তাই? আন্দোলন যে শুধু ডাক্তাররাই করেছিলেন, তা তো নয়! আন্দোলন তো আমার মতো সাধারণ ছা-পোষা লোকজনও করেছিল, জাস্টিসের দাবি নিয়ে আমরাও তো পথে নেমেছিলাম। আসলে এই হেনস্থার মধ্য দিয়ে সরকার বার্তা দিতে চাইল, যদি তুমি প্রশ্ন কর, যদি তুমি রাস্তায় নাম, তা হলে তোমাকেও এ রকম হেনস্থার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু সরকারকে আমরাও জানিয়ে দিতে চাই, সকালের গরম চা থেকে শুরু করে রাতের রুটির সময় পর্যন্ত আমরা সব সময় হেনস্থা হতে থাকি বাসে, ট্রামে, বাজারে দোকানপাটে, অফিসে, ব্যাঙ্কে, রেশনের দোকানে, সর্বত্র। কোথায় আমরা হেনস্থা হই না? অতএব হেনস্থার ভয় আমাদের দেখাবেন না। বরং নিজেরা তৈরি থাকুন এটা ভেবে যে, সাধারণ মানুষ আবার রাস্তায় নামলে সামলাতে পারবেন কি না! তাই আবারও বলছি, ভয় দেখাবেন না!

শবনম সাজু, বেলেঘাটা

স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে গ্রাহক সভা বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া জেলা শহরের মাচানতলায় প্রিপেড স্মার্ট মিটার লাগানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ২৮ মে সব স্তরের গ্রাহকদের নিয়ে সমাবেশের ডাক দেয় অ্যাবেকা। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অমিয় গোস্বামী। জেলার তিনটি ডিভিশনের ও বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েত ও পৌর এলাকার বহু গ্রাহক এই সমাবেশে যোগ দেন। প্রধান বক্তা সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের যোগসাজশে একচেটিয়া বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির পাহাড় প্রমাণ মুনাফার স্বার্থে গ্রাহকদের টাকা লুট করার জন্য এই মিটার।

যেখানেই প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাধারণ গ্রাহক, কৃষক সমাজ ও সচেতন জনগণ স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ করছেন। বাঁকুড়াতেও আন্দোলনকে তীব্রতর করার আহ্বান জানান তিনি। সংগঠনের জেলা সম্পাদক স্বপন নাগও বক্তব্য রাখেন।

প্রতিহিংসামূলক পোস্টিং প্রত্যাহারের দাবি

আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ ডাঃ অনিকেত মাহাতো, ডাঃ দেবাশীষ হালদার, ডাঃ আসফাকুল্লা নাইয়াকে সিনিয়র রেসিডেন্ট নিয়োগের কাউন্সিলিং-এর মেরিট লিস্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যথাক্রমে উত্তর দিনাজপুর, মালদার গাজোল, পুরুলিয়া মেডিকেল কলেজে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে ২৭ মে বলেন, এতে আবারও প্রমাণিত, রাজ্য সরকার আর জি কর কাণ্ডের খুনি এবং ধর্ষকদের পাশেই রয়েছে। চরম নৃশংস এই অপরাধের অপরাধীদের আড়াল করার জন্যই আর জি কর আন্দোলনের নেতৃত্বকে এইভাবে নিয়ম ভেঙে চূড়ান্ত অন্যায় ভাবে দূরবর্তী স্থানে পোস্টিং দেওয়া হল।

তিনি বলেন, প্রধানত সিনিয়র রেসিডেন্টরাই বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামীণ হাসপাতাল এবং প্রান্তিক জেলার মেডিকেল কলেজগুলিতে বিশেষজ্ঞের পরিষেবা দিয়ে থাকেন। এরাই সেখানে মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেন। অথচ দীর্ঘ দু-মাস এদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রেখে, একদিকে স্বাস্থ্য-পরিষেবার যেমন বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে, তেমনই আন্দোলনকারীদের সনাক্ত করে তাদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এই ধরনের অন্যায় বদলি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি এই অন্যায় বদলির নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে মেধার ভিত্তিতে কাউন্সিলিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে পোস্টিং তালিকা তৈরি করা হয়েছিল, সেই অনুযায়ী সকলকে পোস্টিং দেওয়ার দাবি জানান।

নদীবাঁধ সংস্কারের দাবি পাঁশকুড়ায়

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় কাঁসাই নদীর বাঁধ পরিদর্শনে ১৭ মে জেলাশাসক সহ সেচ দপ্তরের কর্তারা এলে তাঁদের কাছে সঠিক ভাবে বাঁধ সংস্কারের দাবি তুলে ধরেন স্থানীয় মানুষ। নদীবাঁধ সঠিকভাবে নির্মাণের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি দীর্ঘদিন আন্দোলন করছে। কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলে কমিটি ডিএম-এর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ভেঙে যাওয়া নদী বাঁধ নির্মাণের গুণগতমান নিয়ে ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, কাঁসাই নদীর ময়না রামচন্দ্রপুর থেকে পাঁশকুড়ার শ্যামপুর পর্যন্ত চলতি বছরে সংস্কার না হওয়ায় কংসাবতী ব্যারেজ থেকে একসঙ্গে অতিরিক্ত জল ছাড়লে আগামী বর্ষাতেও ফের নদীবাঁধ ভেঙে বন্যার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

‘হম দেখেঙ্গে’ মৌলবাদকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ফয়েজ

মহারাষ্ট্রের নাগপুরে ১৩ মে একটি অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ-এর ‘হম দেখেঙ্গে’ কবিতাটি আবৃত্তি করার জন্য তিন জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। টিভিতে উক্ত অনুষ্ঠানের খবর দেখে ওই এলাকার জনৈক ব্যক্তি থানায় অভিযোগ জানান যে, ‘ভারত যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়ছে তখন ভারতে এই কবিতা আবৃত্তি করা দেশবিরোধী কাজ’। এ হেন অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই তিন জনের বিরুদ্ধে বিএনএস-এর ১৫২ ধারায় দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছে।

ফয়েজের ‘হম দেখেঙ্গে’ কবিতাটি বছর পাঁচ-ছয় আগেও ভারতে ব্যাপক মাত্রায় পরিচিত ছিল না। এনআরসি-বিরোধী আন্দোলনের সময় কবিতাটি আলোচ্য হয়ে ওঠে এবং সেই থেকে প্রায়শই তর্ক-বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। আশির দশকে গজল গায়িকা ইকবাল বানো-র কণ্ঠে কবিতাটির গান হয়ে ওঠার রোমহর্ষক ইতিহাসও মূলত তখন থেকেই জনচর্চায় আসে।

আরএসএস-বিজেপি এই কবিতাটিকে হিন্দুবিরোধী তথা ভারতবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং সেই মতো সুযোগ পেলেই নানা জনের বিরুদ্ধে পরপর আইনি পদক্ষেপ করছে। সাম্প্রতিক নাগপুরের ঘটনাটি সেই পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা। এই প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে সমালোচকদের হয়রান করা, আতঙ্কিত করা, বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা এবং জনগণের মধ্যে ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানো ইত্যাদিই যে বিজেপি পরিচালিত সরকারের উদ্দেশ্য, এতে কোনও সংশয় নেই। কারণ, কবিতাটি কোনও ভাবেই হিন্দুবিরোধী বা ভারতবিরোধী নয় বরং মৌলবাদ ও স্বৈরাচারী শোষণ বিরোধী।

পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করেন (১৯৭৭) এবং তাঁর সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে সেই সময় ধর্মীয় মৌলবাদ মারাত্মক ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে বামমনস্ক মানবতাবাদী কবি ফয়েজ ‘হম দেখেঙ্গে’ কবিতাটি লেখেন (১৯৭৯)। একটা সময়ে সরকার মহিলাদের শাড়ি পরাকে হিন্দুয়ানি বলে দাগাতে চায়। এর প্রতিবাদে তখন ইকবাল বানো বরাবরের মতোই শাড়ি পরেই কবিতাটি গান হিসাবে পরিবেশন করেন। এইসব প্রতিবাদের জন্য ফয়েজকে তো বটেই, বানোকেও পাকিস্তান সরকারের চরম রোষানলে পড়তে হয়।

এই ইতিহাস বহু প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও আরএসএস-বিজেপির অভিযোগ, ‘হম দেখেঙ্গে’ কবিতাটির মাধ্যমে হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি ধ্বংস করে ভারতে ইসলামি শাসন কায়েম করার উস্কানি দেওয়া হয়েছে’।

মূল উর্দু ভাষায় লেখা কবিতাটিতে কবি সম্বোধন করেছেন তৎকালীন পাকিস্তানের মৌলবাদী স্বৈরাচারী শাসককে। সেখানে ‘ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানতে’ গিয়ে তিনি ধর্মীয় অনুষঙ্গই ব্যবহার করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, ‘জব অর্জ-এ-খুদা কে কাবে সে/ সব বুত উঠওয়ায়ে জায়েঙ্গে/ হম অহল-এ-সফা মরদুদ-এ-হারাম/ মসনদ পে বিঠায়ে জায়েঙ্গে।’ এর অর্থ বুঝতে গেলে, ইসলামের কাহিনী না জানলে, বিভ্রান্তির শিকার হওয়া স্বাভাবিক। কাবায় একসময় ৩৬০টি মূর্তি (বুত) স্থাপিত হয়েছিল যা ইসলামের নিরাকার একেশ্বরবাদের পরিপন্থী। তাই পরবর্তীকালে সেই সমস্ত মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্ম পালনের ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসা হয়েছে। সেই অনুষঙ্গ ব্যবহার করে ফয়েজ মৌলবাদী শাসককে বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, কাবারূপী ঈশ্বরের এই দুনিয়া (অর্জ) থেকে একদিন সমস্ত ভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষেরাই একদিন সিংহাসনে বসবে বা জগতকে পরিচালনা করবে। তারপর ফয়েজ বলেছেন, ‘সব তাজ উছালে জায়েঙ্গে/ সব তখ্ত গিরায়ে জায়েঙ্গে/ বস নাম রহেগা আল্লা কা।’ অর্থাৎ, একদিন সব স্বৈরতান্ত্রিক চিহ্ন (তাজ বা মুকুট) মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। একাধিপত্যের সাম্রাজ্য (তখ্ত) উজাড় হয়ে যাবে। থাকবে শুধু ঈশ্বরের (আল্লাহ্) নামটুকু।

সমস্ত ধর্মের এই মূল কথাটুকু ফয়েজ স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ধর্মীয় মৌলবাদে মত্ত তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসককে। কিন্তু এই মূল কথাটুকু মেনে চলতে গেলে শাসক শ্রেণির বড় অসুবিধা। শোষণের জন্য তাদের দরকার শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে লাগাতার অনৈক্য, বিদ্বেষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানো। তাই তারা ধর্ম বর্ণ জাত গোত্র ইত্যাদিকে ব্যবহার করে শোষণের রাজনীতিতে। সেই কারণেই স্বাভাবিক ভাবে ‘হম দেখেঙ্গে’ নিষিদ্ধ হয়। যুগে যুগে এ ব্যাপার ঘটেছে। বহু কবিই ধর্মতন্ত্রের, শোষণতন্ত্রের শিকার হয়েছেন। আরএসএস-বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও ভারতের শোষিত জনগণের মধ্যে অনৈক্য বাড়াতে বদ্ধপরিকর। ধর্মের মূল নির্যাসকে অর্থাৎ, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, কল্যাণ কামনা ইত্যাদিকে পাঠ্যক্রম সহ সব জায়গা থেকে তারা ছেঁটে ফেলছে এবং ইতিহাসকে বিকৃত করে গণমাধ্যম সহ সর্বত্র, বিশেষত মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মোদি শাসনে চাষির বঞ্চনা

প্রতি কুইন্টাল ধানে ক্ষতি ৭৬৬ টাকা

আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় ২৮ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘বিকশিত ভারতের’ লক্ষ্য বহু বার উচ্চারণ করলেন। এ-ও বললেন, বিকশিত ভারতের জন্য ‘বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ’ চাই। আর সে জন্য এ রাজ্যে আনতে হবে বিজেপি শাসন। যে দিন প্রধানমন্ত্রী এই ভাষণ দিলেন সে দিনই মোদি সরকারের কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ১৫ দিনের ‘বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান’ শুরু করেছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে ২০২৫ -২৬ সালের খরিফ শস্যের এমএসপি বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষিত হয়। সে ঘোষণা শুনে সারা দেশের কৃষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁরা বলছেন, মোদি সরকার আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করল।

কৃষকদের দাবি কী? কৃষকদের দাবি স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, উৎপাদনের সার্বিক খরচের উপর ন্যূনতম ৫০ শতাংশ লাভ যোগ করে অর্থাৎ সি-টু প্লাস ৫০ পার্সেন্ট ফর্মুলা মেনে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে। এই ফর্মুলায় ধানের দাম ঠিক করলে এক কুইন্টাল ধানের দাম হয় ৩১৩৫ টাকা। বর্তমানে ধানের সহায়ক মূল্য ২৩৬৯ টাকা। ফলে এমএসপি নিয়ে টালবাহানা করায় প্রতি কুইন্টালে চাষির লোকসান ৭৬৬ টাকা। বিকশিত ভারতের প্রচারের আড়ালে এই হল কৃষক বঞ্চনার নির্মম চিত্র।

কৃষকের প্রধান দাবি ফসলের ন্যায্য দাম। ন্যায্য দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি হল, সরকারি উদ্যোগে ফসল না কেনা। কেন সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ফসল কেনে না? যে কেউ বোঝে, কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করতেই সরকার ফসল কিনতে বাজারে নামছে না। ফলে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছেন দেশের কৃষকরা। কর্পোরেট পুঁজিপতিদের এজেন্টরা বিপুল পরিমাণ মুনাফার মার্জিন রেখে যতদূর সম্ভব কম দামে কৃষকদের ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করছে। ফলে চাষ ক্রমাগত অলাভজনক হয়ে উঠছে।

এই কর্পোরেট হাঙরদের থাবা থেকে কৃষককে কিছুটা বাঁচাতে হলে সরকারি উদ্যোগে ফসল কেনা জরুরি। সে জন্য ফসলের এমএসপি ঘোষণা করা জরুরি এবং তা নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগে ফসল কেনার পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। জরুরি, প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করা। অথচ এখানেই রয়েছে সরকারের চরম অবহেলা। কৃষক সংগঠনগুলির অভিযোগ, এমএসপি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার চাষিদের নানা ভাবে বঞ্চিত করছে। প্রথমত, সরকার উৎপাদন খরচ যা দেখাচ্ছে তা গোঁজামিলে ভরা। বর্তমানে কৃষি উপকরণগুলি কর্পোরেট মালিকদের অধীনে। তারা এ সবের দাম চড়া হারে বাড়াচ্ছে। ফলে কৃষির খরচ অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এমএসপি নির্ধারণের সময় দাম কম করে দেখানো হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন খরচের উপর ৫০ শতাংশ যোগ করার সুপারিশও সরকার মানছে না। তৃতীয়ত, সরকারি হিসাব অনুযায়ী যে ৬ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, সেটাও কৃষি ফসলের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধরা হচ্ছেনা। চতুর্থত, এমএসপি যা ঘোষিত হচ্ছে, সেই অনুযায়ী প্রায় অর্ধেক ফসলও সরকার কিনছে না। যেমন ২০২৩-২৪ সালে দেশে উৎপাদিত ধানের মাত্র ৫৬.৫ শতাংশ এবং গমের মাত্র ২৩.২ শতাংশ সরকার কিনেছে। এইভাবে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার শুধু বাংলায় নয়, সারা দেশের কৃষকদের বঞ্চনা করছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে। ফলে বিজেপি যে বিকশিত ভারত বা বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের কথা বলছে, সেখানে কর্পোরেটদেরই রামরাজ্য হবে। সাধারণ মানুষের হবে সর্বনাশ।

সাধারণ মানুষের কী এল গেল

তিনের পাতার পর

অসমতা ইত্যাদি সমস্যায় চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিপর্যস্ত। দেশের বেশিরভাগ মানুষের ঘরে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসার খরচ সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শিক্ষার খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। জনস্বাস্থ্য বিপন্ন। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে না। বিপুল পয়সা খরচ করে আজ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কিনতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধিপ্রতি বছর দেশের দশ কোটি মানুষকে দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে (দ্য ওয়্যার জুলাই ২০২৪)। অর্থাৎ সরকারের মানসিকতা হল— দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ খাবারের পরিমাণ ও মান কমাক, জীবন যাপনের মান কমাক আর চিকিৎসা কোনও রকমে ঠেকনা দিয়ে চলুক। আর অন্য দিকে আম্বানি, আদানিদের মতো ধনকুবেরদের সম্পদের পাহাড় আরও উঁচু হতে থাকুক। সরকারের যাবতীয় পরিকল্পনা সম্পদের শীর্ষে থাকা ওই দশ শতাংশ মানুষকে নিয়েই। এই দশ শতাংশকে আরও বেশি মুনাফা লুটে আরও বেশি ধনী হওয়ার সুযোগ কী ভাবে তৈরি করে দেওয়া যায়, সরকারের একমাত্র লক্ষ্য সেটাই। এর জন্যই তাদের যাবতীয় পরিকল্পনা। ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে অবশ্য এই সংখ্যাটাও যা তা অনেক দেশের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি।

ফলে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ যারা একেবারে নিচের দিকে পড়ে রইল, তাদের কী যায় আসে ভারত চতুর্থ হল না প্রথম হল, তাতে! আমেরিকা প্রথম অর্থনীতির দেশ। সেই আমেরিকাকে সবার সেরা করার স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় বসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হাজার হাজার সরকারি কর্মচারীকে চাকরি থেকে ছেঁটে ফেলে পথে বসিয়েছেন। কেউ কি ভুলতে পারে কোভিড অতিমারির সময়ে কী ভাবে লাখে লাখে দরিদ্র মানুষ আমেরিকায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন! ভোলা কি যায় শোষিত-বঞ্চিত সেইসব মানুষের কথা, যাঁরা ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, স্লোগান তুলেছিলেন— আমরা ৯৯ শতাংশ? তেমনই ভারত যখন অর্থনীতিতে চতুর্থ, তখনও ভারতের বেকার সংখ্যা গত ৪৫ বছরের শীর্ষে। বিরাট সংখ্যক শিশু বয়সের তুলনায় কম ওজন এবং কম উচ্চতা নিয়ে বড় হচ্ছে। প্রসূতি মায়েদের অর্ধেকই অপুষ্টির শিকার। ঋণগ্রস্ত চাষিরা ফসলের দাম না পেয়ে লাখে লাখে আত্মহত্যা করছেন। তাই অর্থনীতির এই বহরবৃদ্ধি নিয়ে ‘দিন আনা দিন খাওয়া’ রাম-রহিমদের কিছুই যায় আসে না।

আসলে এক ভারতের মধ্যে আছে দুটো দেশ। একটা ইন্ডিয়া যা দশ শতাংশ মানুষের। যাদের খাবার-সুশিক্ষা-সুস্বাস্থ্য-আমোদ-প্রমোদ সব আছে। আর একটা নব্বই শতাংশের ভারত, যাদের উপর শোষণ লুণ্ঠন চালিয়েই উপরের দশ শতাংশের সমস্ত ভোগ-সুখ। এই নব্বই শতাংশের সব থেকেও কোনও কিছুতেই অধিকার নেই। তাদের জীবনে শুধু নেই আর নেই। এদের জন্য আছে শুধু হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-দলিত, রাম মন্দির-মথুরা-কাশী, সন্দেহের বশে পিটিয়ে মারা, যুদ্ধ উন্মাদনায় মাতিয়ে রাখা আর তারই ফাঁকে তাদের সবকিছু লুটে নেওয়া। এই বৈষম্য দূর না করা গেলে অর্থনীতির বহরে ভারত চতুর্থ না প্রথম— দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দিকে তাকিয়ে তার কোনও হদিশই পাওয়া যাবে না।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 43 Bengali Weekly June 6, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

একমাত্র আদালতের মাধ্যমেই বিদেশি নাগরিক চিহ্নিত করতে হবে

আসাম রাজ্য কমিটি

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৪ মে রাজ্য সরকারগুলিকে ৩০ দিনের মধ্যে অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিকদের চিহ্নিতকরণের নির্দেশ জারির পর আসাম পুলিশ এবং বর্ডার পুলিশ বিদেশি চিহ্নিতকরণের নামে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরিব মানুষদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করছে। এ সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের আসাম রাজ্য কমিটি এক বিবৃতিতে বলে যে, আসাম সরকার উপযুক্ত আইনি প্রক্রিয়ায় বিদেশি চিহ্নিত করার পথে না গিয়ে যে ভাবে প্রশাসনিক গা-জোয়ারি প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছে, তা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অগণতান্ত্রিক।

এর ফলে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের হেনস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে ইতিমধ্যেই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। রাজ্য কমিটি মনে করে, একমাত্র আদালতের বিচারের মাধ্যমে বিদেশি নাগরিক চিহ্নিত করে তাঁদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

আদালতের দ্বারা চিহ্নিত বিদেশি নাগরিকদের বহিষ্কারের ক্ষেত্রে আসাম রাজ্য কমিটি দৃঢ় ভাবে মনে করে— এ ক্ষেত্রে দেশের সাংবিধানিক রীতিনীতি, প্রাসঙ্গিক আইন, সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন এবং রীতিনীতির ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক চিহ্নিত বিদেশি নাগরিকদের, তাঁদের নিজের দেশের সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেই দেশের সরকারের সম্মতির ভিত্তিতে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনও প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক যাতে হয়রানির সম্মুখীন না হন, তা সুনিশ্চিত করতে একমাত্র আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিদেশি চিহ্নিত করতে হবে বলে রাজ্য কমিটি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করছে।

ফ্যাসিবাদবিরোধী আলোচনা সভা

একের পাতার পর

সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ-উন্মাদনা ও দেশে দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সামনে বামপন্থীরাই মূল শত্রু। তাই মতপার্থক্য থাকলেও বামপন্থীদের, কমিউনিস্ট বলে যারা নিজেদের মনে করে, তাদের প্রয়োজন আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। বামপন্থীদের এক মঞ্চে নিয়ে আসার এই উদ্যোগের জন্য উদ্যোক্তা সংগঠনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান সব দলের বক্তারাই।

আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সর্বভারতীয় সভাপতি, বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন ফ্যাসিবাদ বিংশ শতাব্দীর বিশেষ ঘটনা। সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বাজার দখলের প্রতিযোগিতার আগ্রাসী রূপ থেকে গত শতাব্দীতে ঘটে গিয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফ্যাসিবাদের ঘৃণ্য রূপ দেখা গেছে জার্মানিতে। ফ্যাসিস্ট শক্তির মূল নিশানা ছিল সোভিয়েট রাশিয়া। লাল ফৌজের নেতৃত্বে রাশিয়ার মানুষের বীরত্বপূর্ণ লড়াইতে ফ্যাসিস্ট শক্তি সেদিন পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, তবে পরাস্ত হয়নি ফ্যাসিবাদ।

আজ বিশ্বের নানা দেশে ফ্যাসিবাদ নানা রূপে দেখা যাচ্ছে। ভারতে সাম্প্রতিককালে যুদ্ধ উন্মাদনা, ধর্ম-ভাষা-প্রদেশকে ভিত্তি করে বিভেদের রাজনীতি চলছে। প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ চলছে। ফ্যাসিবাদকে রুখতে হলে সর্বস্তরের জনসাধারণকে এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইতে সামিল হতে হবে। এই লড়াইতে নেতৃত্ব দিতে হবে বামপন্থীদেরই।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ

স্মার্ট মিটার! আপনার পকেট উজাড়

প্রিপেড স্মার্ট মিটার সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য জেনে নিন। এখনই সতর্ক হোন।

স্মার্ট প্রিপেড মিটারের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন অ্যাবেকা শুরু থেকেই আন্দোলন করে চলেছে। এর ফলেই রাজ্য জুড়ে মানুষ আজ প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

- এখন আপনি আগে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তারপর মিটার রিডিং অনুযায়ী বিলের টাকা জমা দেন। স্মার্ট প্রিপেড মিটারে আগে টাকা জমা করতে হবে তারপর বিদ্যুৎ পাবেন। টাকা শেষ হলেই বিদ্যুৎ সংযোগ আপনা-আপনি কেটে যাবে। অন্ধকার নেমে আসবে।
- এখন নির্দিষ্ট ইউনিট পিছু দাম কত আপনি জানতে পারেন। স্মার্ট মিটারে তা হবে না। দাম নির্ধারিত হবে টিওডি পদ্ধতিতে। অর্থাৎ দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাম। বিদ্যুতের চাহিদা অনুযায়ী কোম্পানি তার ইচ্ছামতো দাম বাড়াবে। বিদ্যুৎ খরচ ব্যাপক বাড়বে। আপনার পকেট উজাড় হবে।
- এখন আপনি বিদ্যুৎ বিল হাতে পান। কী জন্য কত দাম দিচ্ছেন জানতে পারেন। স্মার্ট মিটার বসলে কোনও বিল হাতে পাবেন না। ফলে কত ইউনিট খরচ করছেন, তার দাম কত, মিটার ভাড়া কত, ফিক্সড চার্জ কত বা অন্য কোনও চার্জ নেওয়া হচ্ছে কি না সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারবেন না।
- স্মার্ট মিটার যা কিনা ৫/৭ বছর চলে, খারাপ হলে আবার নতুন মিটার বসাতে হবে। এই টাকা কোথা থেকে তোলা হবে? আপনার ঘাড় ভেঙে নয় তো?
- বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ অনুযায়ী প্রিপেড স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক নয়। আপনার অনুমতি ছাড়া কখনই কোথাও এই মিটার বসানো যায় না। তাই জোর করে লাগানো বেআইনি।
- স্মার্ট মিটারে রিডিং নেওয়ার, বিল দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। তাই মিটার রিডার সহ কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ারদেরও চাকরি চলে যাবে। কর্মসংস্থানও হবে না। বেকার বাড়বে।
- এ আই অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্ত্রণে মোবাইলের সাথে যুক্ত থাকবে স্মার্ট মিটার। তাই সাইবার ক্রাইমের সম্ভাবনা যেমন থাকবে তেমনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সব কিছু চাইলেই সবাই জানতে পারবে।

তাই এখনই স্মার্ট মিটার লাগানো রুখে দিতে এলাকায় এলাকায় সকলে সতর্ক হোন, ঐক্যবদ্ধ হোন। কোনও প্রয়োজনে অ্যাবেকার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ ঃ ৮৯১৮৯৩২০৭৮, ৮৬২১৯৮৩৬৮৭

এ আই ডি এস ও সম্মেলন পুদুচেরিতে

পুদুচেরির ভেঙ্কটনগরে তামিল সংঘম হলে ২৭ মে অনুষ্ঠিত হল এআইডিএসও-র প্রথম রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কাউন্সিলের সভাপতি কমরেড সৌরভ ঘোষ। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এবং রাজ্যে রাজ্যে সরকারগুলি যে শিক্ষাবিরোধী ও ছাত্রস্বার্থ বিরোধী নীতি নিচ্ছে তা থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব বাঁচাতে এই সম্মেলনের প্রধান বক্তা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শিবাশিস প্রহরাজ ছাত্রদের কাছে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এলাঙ্গো, এস ইউ সি আই (সি) পুদুচেরি রাজ্য সম্পাদক কমরেড লেনিন দুরাই, এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুধাকর প্রমুখ।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক কমরেড আর অপর্ণা এ আই ডি এস ও-র প্রথম পুদুচেরি রাজ্য কমিটির নাম প্রস্তাব করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড এস দিব্যা।

কমরেড এস সারথিকে সভাপতি এবং কমরেড রণদিভেকে সম্পাদক করে ২১ জনের রাজ্য কমিটি ও ৫৫ জনের রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com